সমকাল
১১ জুলাই ২০১০

তৃণমূলে নারীর অগ্রযাত্রা
স্থানীয় সরকার

আমেনা মহসীন

একটি মেয়ের অপরাধ যে সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলেছে। এজন্য সালিশ বসেছে এবং তাকে একশ' দোররা মারার রায় প্রদান করা হয়েছে। এমন নয় যে, ওই গৃহবধূর স্বামী এজন্য 'সমাজের' কাছে নালিশ দিয়েছে। এ ধরনের একটি ঘটনা সম্প্রতি সংবাদপত্রে এসেছে এবং তা আমাদের উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত না করে পারে না। এটা একটি এলাকার ঘটনা, কিন্তু দেশের কোনো না কোনো স্থানে এমন ঘটনা নিয়মিতই ঘটছে। মৌলভীবাজারের ছাতকছড়ার নূরজাহানের ট্র্যাজেডি নিশ্চয়ই আমরা ভুলিনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সমাজের মধ্যেই এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত শক্তি নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে পারছে? তাদের ক্ষমতার উ□সই-বা কী? রাষ্ট্র ব্যক্তির জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, কিছু ব্যক্তি মানুষের জীবনে প্রবেশ করছে, তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে তেমন ভূমিকা রাখছে না। রাষ্ট্র বিষয়টি মেনে নিচ্ছে, সেটা বলা যাবে না। আবার যখন এ ধরনের অগ্রহণযোগ্য আচরণ ঘটছে, ব্যক্তির অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তখন রাষ্ট্র চুপ থাকছে কিংবা যা করার তা করছে না। তাহলে কি রাষ্ট্র অসহায়? ব্যক্তির ভূমিকা কীভাবে রাষ্ট্রের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারছে?

নারী কিন্তু এখন আর গৃহকোণে বাঁধা নেই। তার সামাজিক ভূমিকা আমরা দেখছি। সে সমাজের নানা ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিচ্ছে। রাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে কখনও সহায়তা দিচ্ছে এবং কখনও-বা যা করার তা করছে না কিংবা এমনকি কোথাও কোথাও প্রতিবন্ধক হয়ে উঠেছে। এ বাধা দূর করার জন্য বিভিন্ন নারী সংগঠন কাজ করছে। গণমাধ্যম ভূমিকা রাখছে। আন্তর্জাতিক প্রভাবও কাজ করছে। তবে তা আরও বাড়ানোর তাগিদ রয়েছে।

নারীর এই পথচলায় স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এটা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে নারী ব্যক্তি হিসেবে এবং নাগরিক হিসেবে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এটা ঠিক যে, স্থানীয় সরকার রাজনীতিমুক্ত নয়। সামরিক শাসকরা স্থানীয় সরকারকে তাদের রাজনৈতিক অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য কাজে লাগিয়েছে। তারা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ চেয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্যে। কিন্তু তারপরও গত কয়েক বছরে স্থানীয় সরকারের কাজের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, সেটা উপেক্ষা করার জো নেই। আমাদের দেশে ক্ষমতা হচ্ছে একটি কেন্দ্রীভূত ধারণা। ক্ষমতার দ্বারা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার নারীর ক্ষমতায়নে যারা বিশ্বাসী, তারা বলেন, এটা বেড়ে উঠতে হবে যৌথভাবে। ফলে নারীর সক্ষমতা বেড়ে যায়।

আমি বিষয়টিকে বলতে চাই, ক্ষমতার কাঠামোর ফেমিনাইজিং। অনেকেই প্রশ্ন করবেন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ হলেই কি নারীর ক্ষমতায়ন হবে? দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন রয়েছে। কেবল ইউনিয়ন পরিষদেই রয়েছেন ১২-১৩ হাজার নারী সদস্য। ৪৮১টি উপজেলা পরিষদের প্রত্যেকটিতে রয়েছেন একজন করে মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান। তাদের নির্বাচিত হতে হয় নির্বাচনী এলাকার নারী-পুরুষ সবার ভোটে। জাতীয় সংসদেও রয়েছে সংরক্ষিত নারী আসন। কিন্তু এরপরও কি নারীর ক্ষমতায়ন যথাযথভাবে ঘটছে বলে ধরে নিতে পারি? এ প্রশ্ন গ্রহণ বা নাকচ কোনোটিই না করেও বলতে পারি, যেভাবে চলছে তাকে আমরা প্রথম ধাপ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। আমরা সামনে এগিয়ে চলেছি। আর এটাকে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল বলা যেতে পারে। যারা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তারা কি এভাবে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। তবে এটাও এখন লক্ষ্য করার মতো যে, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভায় যেসব নারী সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তাদের বিপুলসংখ্যক ভোটারের কাছে যেতে হয়। স্থানীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থায় তাদের জন্য বাড়তি সুবিধা নেই। কিন্তু জবাবদিহিতা ষোলোআনা। নির্বাচিত হওয়ার পর তাদের কাজের পরিবেশও প্রত্যাশিত মাত্রায় থাকে না। এসব তারা মেনে নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশন একটু সচেতন হলে তৃণমূল পর্যায়ের এসব নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। যাদের পারিবারিক অর্থনৈতিক ভিত দুর্বল তাদের জন্য এটা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এর ফলে কেবল সচ্ছল ও প্রভাবশালী পরিবারের নারীরাই স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচিত হয়ে আসতে পারে বলে যে ধারণা রয়েছে সেটা দূর করা সম্ভব। সাধারণত দেখা যায়, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী পরিবার কিংবা শ্বশুর বা স্বামীর প্রভাব খাটিয়ে অনেকে নির্বাচিত হন। এ বিষয়টিকে অনেকে বিকেন্দ্রীকরণের কুফল বলেও মনে করেন। কিন্তু পাথওয়েস টু ওমেন এমপাওয়ারমেন্টের গবেষণায় দেখা গেছে, স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের সুফল ধীরে ধীরে মিলতে শুরু করেছে। গ্রাম পর্যায়ে অনেক নারী জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে উঠতে শুরু করেছেন। তারা পথ খুলে দিচ্ছেন। তারা ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও উপজেলা অফিসে বসছেন। এমনকি হাট-বাজারেও জনগণের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতবিনিময় করছেন। ভোটের আগে তারা বাজারে সভা করছেন। ভোটের পরও করছেন। তারা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন এবং পুরুষদের সঙ্গেও মতবিনিময় করছেন। নির্বাচিত সংস্থায় পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে তাদের তর্কযুদ্ধে নামতে হচ্ছে। মতের অমিল ঘটছে এবং কখনও কখনও তা তীব্র বিতণ্ডায় রূপ নিচ্ছে। তারা রাতে চলাফেরা করছেন এবং কখনও কখনও একাও চলছেন। এসব হচ্ছে আশার দিক। আর এটা এমন একটি দেশে ঘটছে যেখানে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য নারীকে প্রকাশ্যে দোররা মারার বিধান দিচ্ছেন কিছু 'সমাজপতি'। তারা ধর্মের নামে নারীকে গৃহকোণে আটকে রাখার কথা বলেন। তবে কেবল ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিরুদ্ধেই এমন অভিযোগ করা ঠিক নয়। সেক্যুলার শক্তির মধ্যেও রয়েছে রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা কাজ করে। আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধে কিংবা তারও আগে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলনে নারীসমাজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তারপরও প্রগতিবাদীদের মধ্যে রক্ষণশীলতা কাটছে, সেটা বলা যাবে না। এটা দূর করতে না পারলে নারী তার সাংস্কৃতিক ও শারীরিক বাধা জয় করে সমাজের নানা ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত ভূমিকা নিতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা রয়েছে সেটা চিহ্নিত করায় নারী-পুরুষ সবার সহায়তা চাই। নারীকে ঘরের বাইরে

দেখলে যারা চ্যালেঞ্জ করে, যারা বলে নারী কেন সভায় তর্ক করবে বা বড় গলায় কথা বলবে তাদের থামিয়ে দেওয়ার কাজ সহজ নয়, কিন্তু সেটাই করতে হবে। এটাও তুলে ধরতে হবে যে, মানুষের সেবা কিংবা সমাজের কল্যাণ করার দায়ভার কেবল পুরুষের নয়, নারীও তাতে ভূমিকা রাখতে পারে। এ ধারণাও ভাঙতে হবে যে, কোথাও পুরুষ জোর গলায় কথা বললে সেটা পৌরুষ কিন্তু নারী ন্যায্য কথা নিয়ে সোচ্চার হলে সেটা উচ্ছৃঙ্খলা। পাথওয়ে টু ওমেন এমপাওয়ারমেন্টসহ নানা প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা গেছে, তৃণমূল পর্যায়ে নির্বাচিত নারীরা এগিয়ে আসছেন। তারা যেখানে দ্বিমত করছে সেখানে উন্নত কিছু বলতে চাইছে। উন্নয়ন ইস্যুতেও তারা ভূমিকা রাখছেন। অনেক এলাকায় দেখা গেছে, ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যরা সড়কপথ ঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কি-না সে জন্য সরেজমিন হাজির থাকছেন। পরিষদের সভায় তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ইস্যুগুলোতে জোর দিচ্ছেন। বিনোদন সুবিধার কথা বলছেন। স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো যে কেবল পুরুষের কথা বলার জন্য, এ ধারণাও তারা ভেঙে দিচ্ছেন। তবে এটা ঠিক যে, আমাদের স্থানীয় সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের কথা বলেন। কিন্তু ক্ষমতার রাশ টেনে ধরে রাখেন। উপজেলা পরিষদের নারী ভাইস চেয়ারম্যানরা বলেন, তাদের কাজ কী সেটা স্পষ্ট করা হচ্ছে না। চেয়ারম্যান এবং পুরুষ ভাইস চেয়ারম্যানরাও একই কথা বলেন। এ কারণে বলা যায়, স্থানীয় সরকারের হাতে আরও ক্ষমতা প্রদানের সমস্যা কেবল নারীর নয়। এটি গুরুতর সমস্যা এবং তার সমাধান অবশ্যই চাই। আর এটা করতে পারলে অর্থা স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব হলে সার্বিকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা আরও বেড়ে যাবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার, বিভিন্ন সংস্থা, এনজিওসহ সমাজের নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা অপরিহার্য। আমাদের সরকারি কর্মকর্তা পদে কেউ যখন যোগদান করেন, তখন তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। স্থানীয় সরকারে বিপুলসংখ্যক নারী নতুনভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের জন্যও এ ধরনের ট্রেনিং দরকার। শুধু মাঝে মধ্যে ওয়ার্কশপ-সেমিনার নয়, নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে হবে তাদের কাজ কী এবং কী কী সুযোগ-অধিকার তাদের জন্য নির্ধারিত। পুরুষ সদস্যদের জন্যও এর প্রয়োজন রয়েছে। নারীর অধিকারের জন্য কী কী আইন রয়েছে সেটা সবার জানা দরকার। অনেক ইউনিয়ন পরিষদে দেখেছি যে, নারী সদস্যরা জমিজমা সংক্রান্ত সালিশ হলে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের পাঠান। তারা ধর্মীয় কারণেই সম্পত্তির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। সম্পত্তির সমস্যা তারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন না। এ সংক্রান্ত অনেক আইনও তাদের অজানা। ফতোয়ার শিকারও বেশিরভাগে ক্ষেত্রে নারী। এর কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। তদুপরি রয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের যুগান্তকারী রায়। ৮ জুলাই হাইকোর্টের রায়ে বলা হয় : 'ফতোয়ার নামে বিচারবহির্ভূত কার্যক্রম ও শাস্তি প্রদান অবৈধ। এ ধরনের শাস্তি ঘোষণাকারীকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করতে হবে।' দেশকে প্রচলিত আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতেই চলতে হবে। এ রায় নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জনের পথে বড় ধরনের অগ্রগতি হিসেবেই দেখতে হবে। সালিশের মাধ্যমে যারা অপরাধীর সঙ্গে, নির্যাতনকারীর সঙ্গে মিলমিশে কথা বলেন তাদের জন্যও এ রায় সতর্কবার্তা।

তৃণমূলের স্থানীয় সরকারে যেসব নারী সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের কিন্তু সামাজিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি

ঘর-সংসারও সামাল দিতে হয়। এর মধ্যেও তারা সমাজের অনেক সেকেলে ধারণা বদলে দিতে পারছেন। তারা পথ খুলে দিচ্ছেন। এ পথে অন্যরা যেন আরও ভালোভাবে এগিয়ে আসতে পারে তার সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারলে এ কাজ আরও সহজ হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, এসব পদে নির্বাচিতরা রাজনৈতিক দলের সদস্য হবেন না কিংবা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন না। মূল কথা হচ্ছে, তাদের কাজে দলীয় রাজনীতির প্রভাব পড়তে না দেওয়া। তাদের হতে হবে এলাকার সব মানুষের প্রতিনিধি। রাজনীতির অনেক হিসাব-নিকাশ থাকে। কিন্তু স্থানীয় সরকারকে রাজনীতির ঊধর্্বে উঠে কাজ করতে হবে। স্থানীয় সরকারে নির্বাচিতরা রাজনীতি অবশ্যই করবেন, কিন্তু এ সংস্থায় থাকা পর্যন্ত কেবল একটিই রাজনীতি থাকতে হবে_ জনগণের রাজনীতি।

আমেনা মহসীন : রাজনৈতিক বিশ্লেষক